দৈনিক
জনকণ্ঠ

26. MAR 2003

গত তিন দশকে বাংলাদেশে শিক্ষার যে উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটেছে তা লক্ষ্য করবার মতো সত্য। পরিমাণ, বৈচিত্র্য, শতকরা হার এবং বিশেষ করে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি নিতান্ত হতাশাবাদীরাও অস্বীকার করবেন না। গুণ ও মান নিয়ে অবশ্য সংশয় রয়েছে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতির বিবেচনায় পরিমাণের পাশাপাশি গুণ ও ...ুটি অবশ্যই আসবে। সেটা আসছেও। কিন্তু আরও প্রাথমিক ...ন্ধী, দু'টি জিজ্ঞাসা সব দেশের শিক্ষাব্যবস্থা প্রসঙ্গেই উঠে ...বশেষভাবেই আসে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। প্রথম জিজ্ঞাসাটা ... দ্বিতীয়টি ভাষাতাত্ত্বিক।

...া অবশ্যই? কিন্তু কেন, কোন উদ্দেশ্যে শিক্ষা? এই প্রাথমিক ... বলতে পারি দার্শনিক। দ্বিতীয় প্রশ্নটি কোন ভাষায় শিক্ষা; ...া চলে ভাষাতাত্ত্বিক। সব দেশেই এ প্রশ্ন দু'টি উঠেছে, অনেক ...তার মীমাংসাও হয়েছে। আমাদের দেশে হয়নি। আমরা ...্যাপারেই এখনও সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক মীমাংসায় পৌঁছতে পারিনি; ...াঙ্গে সংলগ্ন ওই দু'টি ব্যাপারেও সেই একই ব্যাপার ঘটেছে। ...হাল ছেড়ে দিয়েছি। হাল ছেড়ে দিলে যা ঘটে তাই ঘটেছে। ...স্রোত নৌকাকে সঙ্গে নিয়ে চলে নৌযানের আরোহীদের কিছু ...থাকে না। স্রোতটা বিকৃত পুঁজিবাদের। পুঁজিবাদের তবু কিছু ...হ, বিকৃত পুঁজিবাদ বড়ই কদর্য, লুণ্ঠনকারীরা যেমন কদর্য ...দের তুলনায়।

...ন, এই জিজ্ঞাসার জবাবটা সোজা। শিক্ষা জ্ঞানের জন্য। কিন্তু ...বেন না যে জ্ঞানই যথেষ্ট, যদিও জ্ঞান মানুষকে শক্তি দেয়। ...সঙ্গে অন্যান্য গুণের বিশেষ করে হৃদয়ানুভূতির বিকাশ না

ও পাকিস্তান আমলের মতোই রাষ্ট্র এগিয়েছে পুঁজিবাদী বিকাশের পথে। আর অগ্রগমনের সেই ধারাই ধরা পড়েছে শিক্ষার পুঁজিবাদী দার্শনিক ভিত্তিতে। এটাই স্বাভাবিক। রাষ্ট্র অনেক কিছুকেই নিয়ন্ত্রিত করে। শিক্ষাব্যবস্থাকে তো অবশ্যই।

রাষ্ট্রের যারা কর্তা তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে। প্রতিযোগিতা হচ্ছে জীবনের ধর্ম এবং তাকে যে অবাঞ্ছিত বলা যাবে তাও নয়, কেননা প্রতিযোগিতা ছাড়া অগ্রগতি নেই। কিন্তু আমাদের শাসকশ্রেণীর ভিতর যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সেটা মোটেই সুস্থ নয়, সমষ্টিগত অগ্রগতির জন্য যে সুহায়ক তাও নয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টির নয়, লুণ্ঠনের। শিক্ষাক্ষেত্রেও ওই একই প্রতিযোগিতা। যে যেভাবে পারে ভাল ফল করতে চায়। নকল করা থেকে শুরু করে কোচিং সেন্টারের সাহায্য নেয়া পর্যন্ত কোন পদক্ষেপকেই অন্যায্য মনে করে না। শিক্ষা এখন শিক্ষালয়ের ব্যাপার ততটা নয় যতটা সে ব্যাপার ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনার।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আরেকটি কীর্তি হচ্ছে সবকিছুকে পণ্যে পরিণত করা। দেশে এখন বিনামূল্যে কিছুই পাবার উপায় নেই, না সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসা, না আদালতে বিচার। অনুরূপভাবে শিক্ষাও পণ্যে পরিণত হয়েছে। ক্রয়-বিক্রয় চলছে। সে-ই কিনতে পারবে যার টাকা আছে, তাজা মাছের মতো তাজা শিক্ষাও টাকাওয়ালার থলেতেই পড়ছে, লাফ দিয়ে। কোচিং সেন্টার থেকে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ওই একই ব্যবস্থা। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়েও এখন তুলনামূলকভাবে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেমেয়েরাই আসে, অজপাড়া গাঁয়ের গরিব কৃষকের সন্তানেরা আসে না, আসতে পারবে বলে ভাবতেও পারে না। পুঁজিবাদী বিকাশের কল্যাণে শ্রেণীবিভাজন আজ অন্য যে কোন কালের তুলনায় অনেক বেশি নির্মম ও আপোসহীন। ফাঁকফোকর সব বন্ধ।

...ক্ষার ক্ষেত্রে আলো এবং অন্ধকার

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

...ক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ বলা যাবে না। শিক্ষা মানুষকে মানুষ করে ...এ উক্তি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু মানুষ বলতে কোন ধরনের ...ব সে বিবেচনা তো থাকেই, থাকবেই। স্বার্থপর প্রাণীকে কি ...লব, নাকি মানুষের কাছ থেকে আশা করব মানবিক ...? তাকে নিশ্চয়ই আমরা যথার্থ মানুষ বলতে রাজি হব না যার ...ক্তি আছে, কিন্তু শক্তিকে যে প্রয়োগ করে অন্যকে পীড়ন ...মানুষের মনুষ্যত্ব বিশেষভাবে পরীক্ষিত ও প্রতিফলিত হয় ...ঙ্গে সমষ্টির সম্পর্কের ক্ষেত্রে। ব্যক্তি বিকশিত হবে, কিন্তু সে ...য় তার বিকাশের পিছনে অন্যের সাহায্য আছে এবং অন্য ...শক্ত করে সে স্বাভাবিক থাকবে না, টিকেও থাকবে না; তার ... থাকতে যে পানির ফোঁটাটি শুকিয়ে মরবে যদি আরও অনেক ...আশ্রয় না পায়।

...শিক্ষা আমরা এতকাল পেয়ে এসেছি এবং এখনও পাচ্ছি তার ...ট হলো তুমি নিজে বড় হও, অন্যের কথা ভেবো না। নিজের ...তেল দাও, আপনি বাঁচলে বাপের নাম, চাচা আপন প্রাণ ...ব প্রবাদ উক্ত নৈতিকতা তো নয়ই সাধারণ মনুষ্যত্বের কথাও ...এদের উদ্ভব এক ধরনের হতাশা থেকে; শিক্ষার কর্তব্য এদের ...মূল্যবোধটিকে অপসারিত করে শিক্ষার্থীদের হৃদয়বান ও ... ব্যক্তি হিসাবে গড়ে তোলা। এটা দেখে আশ্চর্য হবার কথা, ...রা হই না যে অপসারণ তো অনেক বড় দায়িত্ব, শিক্ষা বরঞ্চ ...র মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিকেই পুষ্ট করছে। অনবরত বলা হচ্ছে ...াধ্যমে তুমি নিজে বড় হও অন্যকে পদদলিত করে।

...আমরা পরাধীন ছিলাম। পরাধীন অবস্থায় আমরা স্বাধীনতা ও ...ন্য সংগ্রাম করেছি। লড়াইটা ছিল সমষ্টিগত; কিন্তু সমষ্টিগত ...সেনি। সমষ্টির শ্রমে উৎপাদিত ফসল ব্যক্তির গোলায় গিয়ে ... আর ওই যে সমষ্টির সংগ্রামে ব্যক্তির মুনাফা লাভ; ওই ... মনোভাবটা শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়েছে। কেবল ...ত নয়, শিক্ষা ওই মুনাফালোভী বিচ্ছিন্নতাকে পরিপুষ্টও

পুঁজিবাদের আরও নিয়মকানুন আছে। নিজস্ব। মানুষকে সে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে; এটা অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে ঘটে, শিক্ষার ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। প্রথমত, এই ব্যবস্থা বিশেষজ্ঞ তৈরির ওপর জোর দেয়; ফলে শিক্ষার্থীরা কেবল নিজ নিজ অধ্যয়নের বিষয়ের ওপরই চোখ রাখে, তার বাইরে যাওয়াকে অপচয়মূলক মনে করে। বলা বাহুল্য, এটা পূর্ণাঙ্গ মানুষ সৃষ্টির পথ নয়। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থীরা সেই সব বিষয়ের অভিমুখেই ধাবিত হয় যেগুলোর বাজার মূল্য অধিক। মানবিক বিদ্যা অবহেলিত হয়। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাতেও ওই দুই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটছে। শিক্ষার্থীরা প্রাণপণে চেষ্টা করছে বিশেষজ্ঞ হয়ে; এবং ব্যবস্থাপনা ও কম্পিউটার সায়েন্স পড়তে চাচ্ছে অন্যসব বিষয়ের প্রতি ভ্রুকুটি করে। ওদিকে আবার যে অনুন্নত ও কর্মসংস্থানে অক্ষম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে আমাদের বসবাস সেখানে শিক্ষা জীবিকার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে না। আগে যতটা দিত এখন ততটাও দেয় না। ফলে ছাত্ররা লেখাপড়ার ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। ওই যে আমরা শিক্ষার মান ও গুণের নিম্নগামিতা নিয়ে অহরহ উদ্বেগ প্রকাশ করছি ওই কাজটা খুবই দেশপ্রেমিক বটে, কিন্তু নিম্নগামিতার কারণ না-বুঝলে প্রতিকার তো অসম্ভব। শিক্ষা যে উঠতে পারছে না তার ব্যাখ্যা ছাত্রদের অনীহায় যেমন পাওয়া যাবে তেমনি পাওয়া সম্ভব শিক্ষকদের পেশাগত আচরণের মধ্যেও। শিক্ষকতার চরিতার্থতা যে শিক্ষাদান ও জ্ঞান সৃষ্টির মধ্যেই নিহিত রয়েছে, অর্থোপার্জনে নেই, এই বোধটা ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসছে। এটা কেবল যে শিক্ষকদের বেলাতে সত্য তা নয়, সত্য চিকিৎসক, আইনজীবী, প্রকৌশলী সকলের ক্ষেত্রেই। সাফল্যের একমাত্র নিরিখ হয়ে দাঁড়াচ্ছে অর্থোপার্জন। শিক্ষকেরাও ওই সোনার হরিণের পিছনে ছুটছেন। বাধ্য হচ্ছেন ছুটতে। ব্যবস্থাই বাধ্য করছে। এই ব্যবস্থা অন্য কোন গুণ চেনে না, অর্থোপার্জনে সাফল্যের বাইরে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই আদর্শিক সমস্যাটির গুরুত্ব কিছুতেই খাটো করে দেখা যাবে না। শিক্ষার সাহায্যে আমরা কোন ধরনের মানুষ তৈরি ...

...ভিত্তিটাই হচ্ছে নাগরিকদের মধ্যে অধিকার ও সুযোগের সাম্য। মেধারই তর বিশেষ থাকবে, যেমন থাকবে চেহারার, কিন্তু ধর্ম, সম্পত্তি বা বর্ণের ভিত্তিতে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করা যাবে না, প্রতিশ্রুতি ছিল এটাই। কিন্তু সংবিধানে এখন আর ধর্মনিরপেক্ষতার কথা নেই। সমাজতন্ত্রের উল্লেখও নেই; এবং কার্যক্ষেত্রে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তো অনেক পরের কথা, এমনকি যথার্থ সংসদীয় গণতন্ত্রও কার্যকর করা যায়নি। রাষ্ট্র এখন নির্লজ্জরূপে পুঁজিবাদী; সে-বৈষম্যকে লালন করে। স্বভাবতই দেশে এখন আর অভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতি চালু নেই। তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেছে শিক্ষা; ধনীদের জন্য ইংরেজী মাধ্যম, গরিবদের জন্য আরবী-নির্ভর মাদ্রাসা শিক্ষা; এবং মধ্যবিত্তের জন্য বাংলা মাধ্যম। শিক্ষা ঐক্য সৃষ্টি করে নি, উল্টো বিভাজনকে দৃঢ়, গভীর ও বিস্তৃত করছে। এ এক বিস্মৃত ব্যবস্থা, যত বেশি শিক্ষায় অগ্রগতি, ততই বৈষম্য এবং বৈষম্যের দরুন অনৈক্য বৃদ্ধি। শিক্ষার উদ্দেশ্য কী এটা হওয়া উচিত? এটা কি রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গলজনক?

বৈষম্য ব্রিটিশ এবং পাকিস্তান আমলেও ছিল। কিন্তু আমরা তো তাকে মেনে নিই নি। বৈষম্যপূর্ণ রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছি। তিন ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি নতুন নয়, পুরাতন বটে। কিন্তু ওই বিভাজনকেও তো আমাদের প্রত্যাখ্যান করবারই কথা; বিভাজনটা তো ছিল পুরাতন রাষ্ট্রব্যবস্থার ন্যক্কারজনক অনুষঙ্গ। তাহলে? আসলে রাষ্ট্র বদলায়নি, বরঞ্চ আগের তুলনায় অধিক মাত্রায় ও স্পষ্টতায় পুঁজিবাদী চরিত্র ধারণ করেছে। আর তার দরুন শিক্ষাক্ষেত্রে আগে যতটা বৈষম্য ছিল এখন সে তুলনায় অধিক বৈষম্য ভৌতিক ও মর্মন্তুদ তাণ্ডব চালাচ্ছে। আমরা খেয়াল করছি না শিক্ষার আলো গোপনে গোপনে এবং সদর্পে কেমন অন্ধকার তৈরি ও বিতরণ করে দিচ্ছে। আলো যত বাড়ছে অন্ধকারেরও ততটাই সুবিধা হচ্ছে। এ এক আশ্চর্য বক্রাঘাত।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করবার আন্দোলন থেকেই স্বাধীন বাংলাদেশের ধারণাটা যে এসেছে এই হিসাবটা মোটেই ভ্রান্ত নয়। বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা বটে। যে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের অভ্যুদয় সেটা ধর্মভিত্তিক নয়, ভাষাভিত্তিক। কিন্তু মাতৃভাষা বাংলা তো মর্যাদা পাচ্ছে না শিক্ষাক্ষেত্রে। উচ্চতর আদালতে যেমন তেমনি উচ্চশিক্ষাতেও বাংলা দিয়ে কাজ চলছে না। ওদিকে বিত্তবানদের ছেলেমেয়েরা মহোৎসাহে ইংরেজী শিখছে। বাংলা মাধ্যমে শিক্ষার এলাকাতেও ইংরেজী বাধ্যতামূলক হয়ে রয়েছে একেবারে শুরু থেকেই।

ইংরেজীর এই জোরটা এলো কোথা থেকে? না, ভাষার ভিতর থেকে নয়। এসেছে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কারণে, বাংলাদেশ যে ব্যবস্থার একটি প্রান্তে রয়েছে। পুঁজিবাদী বিশ্বের রাষ্ট্রভাষা এখন ইংরেজী, তাই ওই ভাষা আমাদের জন্য এতো গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বিত্তবানরা যে বাংলাকে অবজ্ঞা করছে তার কারণ কি? কারণ এই যে তারা মনে করে প্রকাশ্যে না বললেও তাদের মনের ভিতরে ধারণাটা রয়েছে যে, বাংলাদেশের তেমন কোন ভবিষ্যত নেই। যে জন্য বাংলা ভাষা শিখে কোন লাভ হবে না। অবস্থাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, যারা কর্তৃত্ব করে এবং দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত তারা মাতৃভাষার ব্যাপারে আগ্রহী নয়। যেমন নয় মাতৃভূমির বিষয়ে।

মাতৃভাষা তাই শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে না। অথচ সবাই জানেন প্রকৃত শিক্ষা লাভ সম্ভব শুধু মাতৃভাষার মধ্য দিয়েই। ওই সুযোগ আমাদের জন্য এসেছিল। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা সুযোগটি এনে দিয়েছিল। কিন্তু আমরা তাকে কাজে লাগাতে পারিনি। বই লিখতে পারিনি, অনুবাদ এগোয়নি। যেমন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছি। তেমনি বিফলকাম হয়ে গেছি শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষা প্রচলনের ব্যাপারেও। এককালে এদেশের শিক্ষিত মানুষ পরাধীনতার কারণে দ্বিভাষিক হবে এমন অবস্থা হয়েছিল। এখন স্বাধীনতার পরে সমস্ত জাতিকে আমরা দ্বিভাষিক করে তুলতে চেষ্টা করছি। এটা অপচয়মূলক। দেশের সব মানুষ বিদেশে যাবে না। যারা যাবে তারাও কেবল যে ইংরেজী ভাষার দেশে যাবে তাও নয়, আর গেলে যে ভাষা শিখে নিতে পারবে না এমন কোন কথা নেই। সে জন্যই ব্যাপারটা অপচয়মূলক। আর অপচয় করবার মতো সামর্থ্য আর যারই থাক আমাদের যে নেই তা তো নির্মম সত্য।

বাঙালী তার ভাষা নিয়ে বড়াই করে ঠিকই, কিন্তু যেমন তার মাতৃভূমির প্রতি তেমনি মাতৃভাষার প্রতিও নানা প্রকারের অবজ্ঞা ও উপেক্ষা প্রদর্শন করতে অভ্যস্ত। তাই দেখা যাবে অতি উচ্চ শিক্ষিত বাংলাভাষীও কথোপকথনে একাধারে গ্রাম্য শব্দ ও উচ্চারণ ব্যবহার করছে এবং মুহুর্মুহু ইংরেজী শব্দ ও বাক্যাংশের ধ্বনি তুলছে। মানে বাংলার ব্যবহার তাদের মুখে বড়ই কম। অতীতে লিখিত বাংলাকে কেউ ভারাক্রান্ত করেছেন সংস্কৃত শব্দবাহুল্যে; কেউবা অকারণে টানাটানি করেছেন অনিচ্ছুক আরবী-ফারসী শব্দ নিয়ে। বাংলাভাষা সংস্কারেরও নানাবিধ অন্যায় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। সাতচল্লিশের স্বাধীনতার পর হরফ বদলাবার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল, সহজ করবার বেসরকারী উদ্যমেরও অভাব ঘটেনি। একাত্তরের স্বাধীনতার পর আশা করা গিয়েছিল যে এই সব উৎপাত চিরকালের জন্য বিদায় নেবে। নেয় নি। অনেক আপদের মতো বাংলাভাষার ওপর হস্তক্ষেপও ঘটছে। ব্যক্তিগতভাবে কেউ যদি বানান নিয়ে খাড়ামোছা করে সেটা এক কথা; কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিকভাবেও দৌরাত্ম্য চলছে। তথাকথিত প্রমিতকরণের জন্য অভিধান প্রণয়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে। তাঁরা যদৃচ্ছা স্বেচ্ছাচার চালিয়েছেন। বাঙালীর দীর্ঘত্ব খর্ব করে তাকে 'বাঙালি' করেছেন; 'ী' কারটা অশ্লীল ছাতার মতো ধরে রাখা হয়েছে, যেন বাঙালী ঋজুভাবে মেরুদণ্ড শক্ত করে দাঁড়াতে অপারগ। 'গ্রীক'কে গ্রিক করা হয়েছে। কপালগুণে বাংলা 'একাডেমী' বেঁচে গেছে, কিন্তু অন্যত্র 'ী' কার বড়ই তৎপর। কেউ কেউ আবার বলছেন 'ণ' কী দরকার, ঃ বাদ দিলে ক্ষতি কী? কাকে বোঝাবেন?

কাজ না থাকলেই অকাজ দেখা দেয়; চাষ না থাকলে যেমন আগাছায় ভূমি আচ্ছাদিত হয়। সর্বত্র ওটা চলছে; ভাষা সংস্কারের ক্ষেত্রেও ছাড় নেই। কিন্তু আমাদের তো কাজ দরকার। নইলে এগুবো কি করে? নানা বিষয়ে অসংখ্য বই লেখা চাই। অনুবাদ দরকার, দরকার মৌলিক রচনার। কিন্তু তার আগে স্থির সিদ্ধান্ত চাই যে সর্বস্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে এবং দেশে তিনটি নয় একটি অভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। অসম্ভব? তা বাংলাদেশ যে স্বাধীন হবে এটাও তো এক সময়ে অসম্ভব ও বিপজ্জনক কল্পনা ছিল; কিন্তু তবু একটি স্বাধীন রাষ্ট্র তো আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি। প্রকৃত স্বাধীনতা আসে নি এটা সত্য; আসে নি যে তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ তো বাংলাভাষার দুরবস্থা। আমাদেরকে তো চেষ্টা করতে হবে; একা নয়, সমবেতভাবে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথম বিবেচনাটা অবশ্য মাতৃভাষার ব্যবহারের চেয়েও